Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 209 - 227
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চারিত্র্য

অপূর্ব রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (আসানসোল)
Email ID : rapurba26@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Zamindar, Pride, Antyaj, Farmer, Poet, Santal, Jhumurdal.

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay has accepted the great tradition in Bengali literature, and has definitely established a new one by overshadowing it. In the novels of the novelist Tarashankar Bandyopadhyay, he has portrayed the entire socio-economic-political life of the indigenous and lower class brats of rural Bengal. In one such novel, 'Chaitali Vorti' (1931), we find a pitiful picture of a group of helpless lower class people. The story of 'Chaitali Vorti' is written about the sorrows and hardships of the very ordinary poor people of that time when the wind of partition was blowing in the markets, fields and ghats of India. During this time, the poor peasants lost their rights on agricultural land and became agricultural laborers, forced to become workers in urban factories. In Chaitali Vorti, Tarashankar painted a picture of the plight of the people in the socio-political and economic context of that time through the characters of the group. In the novel ' Kalindi' (1940), a char of the Kalindi river appeared on the edge of the village of Raihat. A dispute started over that char. All the old landlords of the village claimed ownership of this char. The people of the Anantya class who once built their homes on the char were exploited and expelled from their rights. On the other hand, Centered on the char that rises on the riverbed Big businessmen want to capitalize on their business through industrial construction. As a result, the helpless Santal Antyaja class people leave agriculture and become factory workers. Ganadevata (1942) is a famous novel by Tarashankar Bandyopadhyay. In the assembly at Chandimandap in the novel, Aniruddha Karmakar and Girish Chutor are heard saying against the long-standing rural customs that they do not get the right price for their work, so they have set up shop in the city in the hope of cash wages. In this assembly, they raise their voice against Sri Hari. Like Patubayan, Antyaja also complains to Chowdhury Mashai against Chiru that he went to his sister Durga's house and when he protested, Patu was even beaten. We see the lower class Antyaja class protesting against Sri Hari Ghosh, the feudalism of the landlords, the police

station, and the British rule. Even the Harijan villagers protested and said that they would not remove the roof of the Chandi Mandap without any money. The novel ' Hansuli Banker Upokatha ' (1947) is about the Kahar community of the bamboo-growing village on the bank of the Kopai River. Written. The structure of the capitalist society is changing. Big businessmen want workers for their work. The Kahar class is becoming that worker. This change in Kahar society is happening at the touch of the Karali. However, earlier this lower class society used to lie at the feet of the upper class. They have endured the oppression and rule of the feudal society, the indigo farmers, the landlords and the Sadgop farmers for ages. However, the new community like the Karali could never accept this oppression. Therefore, they did not retreat, they wanted to change themselves forever. This change quickly spread to this lower class society. The Kahars left their caste business, left agriculture and enrolled in the railway factory in Chandanpur in droves in the pursuit of food and clothing. However, Banwari never accepted this change, The conflict between the old and the young continues throughout the novel, with Kahad's superstitious mind, his daily deception by capitalist society due to ignorance, and his failure to understand his own privileges.

Discussion

'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য - এই তিন বর্ণ জন্মের পর শেষজাত চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। ঋক বেদের বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গজাত বর্ণগুলির মধ্যে শুদ্র তাঁর চরণ-দেশ থেকে শেষে জাত বলে ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত ছিল না। অনেক পরের অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জাত অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে 'প্রতিলোমজ' সন্তানদের 'অন্ত্যজ' বা 'চন্ডাল' বলা হল। শাস্ত্র সম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন দ্বারা ভ্রষ্ট-সংস্রবের সন্তানদের অন্ত্যজ বলা হয়েছে স্মৃতি শাস্ত্রে। এখন 'অন্ত' শব্দের অর্থ 'নীচ' মনে করা হয় এবং নীচ কুলজাত, অধম নীচাশয়-অস্পৃশ্য ব্যক্তি 'অন্ত্যজ' নামে অভিহিত হয়। আর্য সমাজের বাইরে যে সকল জাতি বেদবিহিত নিয়ম-নীতি মানেন না এবং যাঁদের উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই সেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, কিরাত, কুরকু প্রভৃতি জাতিদের এবং বৈদিক যুগের দাস বা দস্যু, ব্রাত্য এবং নিষাদদেরও আমরা অন্ত্যজ অর্থে নীচজাতি ধরে নিয়ে এদেরও বুঝে থাকি। তাছাড়া, মোঙ্গলয়েড, গোষ্ঠীর কোচ প্রভৃতিও অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্গত। এই অন্ত্যজ শ্রেণি যখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠে তখন তা যুগ ইতিহাসের দলিল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি উচ্চবর্গের জীবনকাহিনি থেকে সরাসরি নিম্নবর্গের রূঢ় বাস্তবতার মাটিতে নেমে আসার প্রবণতা, সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপুল রদবদল সত্যিই অবিস্মরণীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে আমরা সাধারণ নিচুতলার নর-নারীর সুখ-দুঃখের কথা খুঁজে পাইনি তা কিন্তু নয়, কিন্তু তার সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে নগরজীবন, মূলত সমাজের উঁচুতলার বিত্তবান মানুষের জীবন-যাপন। এরপর শরৎচন্দ্রের কাছেই প্রথম সাহিত্যের রসবদল ঘটল। তার কাছেই প্রথম শুনলাম সাধারণ মানুষের কথা। উপন্যাস সাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষগুলির কথা।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের সেকেলেপনা, অলীক কল্পনার প্রাধান্য, আদর্শবাদ ও নৈতিকতার মোকাবিলা করে নব বাস্তবতার আমদানি করতে রাজি হননি। বরং দেশীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাপুড়ে, মেছো, বাউল, মাঝি, ডাইনি কাহার, বাউরী প্রভৃতি অন্ত্যজদের গলিতে গলিতে। বাংলা কথাসাহিত্যে পল্লীর বাস্তবতা শরৎচন্দ্র প্রথম আনলেও তাতে ছিল আবেগ উচ্ছ্বাসের বাহুল্য, এদিক থেকে শৈলজানন্দ ছিলেন তারাশঙ্করের পথপ্রদর্শক। শৈলজানন্দ যার আভাসমাত্র দিলেন তারাশঙ্কর তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবন রহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন। তাঁর লেখনীতে অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বরের মধ্য থেকে মানবমহিমার তুঙ্গতম শৃঙ্গ মাথা তুলেছে, যেখানে মানবাত্মার চরম অবমাননা সেখানেই তার সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় প্রকাশ। নীচুতলার অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনই হয়ে উঠেছে তাঁর একাধিক উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু কিংবা কেন্দ্রীয় চরিত্র।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রতিভার সূর্যালোক যখন পশ্চিম গগনে অস্তগামী এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জোৎস্না যখন ম্লান হয়ে এসেছে, যখন দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে অস্থিরতার স্পর্শ এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যারম্ভ পূর্ব গগনে উঁকি দিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকে বাঙ্গলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তারাশঙ্করের লেখনীর স্পর্শে বাঙ্গলা কথা সাহিত্য নবরূপে নবপ্রাণে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বীরভূম তথা বাঙ্গলার কালজয়ী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার পরতে পরতে তথাকথিত সমাজের অন্তজ শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনচর্চা ও কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের মধ্যে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখা হলো কথাসাহিত্য। আর কথাসাহিত্যিক হিসেবে যে-কজন লেখক এই ধারাকে আকাশচুম্বী আসনে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। তাঁর উপন্যাস সমাজের দর্পণ। খেটে খাওয়া মানুষের জীবনেরই ভাষ্য হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাস। এমনই একজন মানবদরদী শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তবর্গীয় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তার প্রতিটি গল্পে খুব নিপুণভাবে এঁকেছেন। তার লেখায় ভীড় করে আসে রাঢ় বঙ্গের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। আর এইসব নাম না জানা মানুষগুলিই মূলত তাকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। সমাজের প্রান্ত-শ্রেণি কিভাবে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের প্রেম-বিচ্ছেদ, পাওয়া না-পাওয়ার সামগ্রিক রূপ, গ্রামীণ জীবনে টিকে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রাম প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি উপন্যাস। এমনই অন্তজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা উপন্যাস গুলি হল, চৈতালীঘূর্ণি' (১৯৩১), 'কালিন্দী (১৯৪০), হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১৯৪৭), গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'কবি' (১৯৪৪), নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৯৫২) ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে অন্ত্যজ ও প্রন্তবর্গীয় মানুষগুলির জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যাবে।

'চৈতালী ঘূর্ণি' ধারাবাহিকভাবে 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের নভেম্বর (কার্তিক, ১৩৩৬) থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিল (চৈত্র, ১৩৩৬) পর্যন্ত ছয় মাসে। ১৯৩১ সালে এটি গন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির বীজ নিহিত ছিল ১৯২৮ সালে 'কালি-কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শশ্মশানের পথে' গল্পে। এ-বিষয়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ-পথের প্রথম মাইল-পোস্ট। গল্পটি পরবর্তীকালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে।"[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসটির পত্তন জেলখানায় এবং এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'চৈতালীঘূর্ণি' উপন্যাসে অন্তজশ্রেণির মানুষের অসহায়তার এক করুণচিত্র ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরমিঞা নিজের গ্রাম ছেড়ে রাতের অন্ধকারে চলেছিল ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে। পরিস্থিতির চাপে অসহায় গফুর তার কন্যা আমিনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল সেদিন দেশের মায়া ত্যাগ করে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই ছবি নতুন নয়। যুগের ইতিহাসও এই কথাই বলে যে, কোন্ পরিস্থিতিতে কৃষক তার কৃষি জমির উপর থেকে অধিকার হারিয়ে, কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার পর বাধ্য হয় শহুরে কারখানার শ্রমিকে পর্যবসিত হতে। 'চৈতালীঘূর্ণি'তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের বিপন্নতার ছবি আঁকলেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোষ্ঠর জীবনে স্পষ্ট দুটি ভাগ রয়েছে, প্রথম ভাগ তার গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে আর দ্বিতীয় বা অন্তিমভাগ হল শহুরে জীবনকে অবলম্বন করে। দুটি জীবনেই সে বিপন্ন। অতীতে গোষ্ঠর ছিল "গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুর ভরা মাছ-পল্লীর ঐশ্বর্য..." দামিনীও ভাল ঘরের মেয়ে। গোষ্ঠ-দামিনীর দাম্পত্যে অভাব ছিল না, ছিল না ভালবাসার খামতি। আট বছরের দামিনী বিয়ের পর সখা হিসাবে পেয়েছিল সমবয়সী সুবলকে।

সুবল বাউলের ছেলে, মহান্ত খেতাব তার। বাউলের ধর্ম অনুসারে ভিক্ষার চাল জমে জমে তাকে মহাজনে পরিণত করেছে। তবু পিতৃপুরুষের ব্যবসা সে ছাড়তে পারেনি। সুবল তাদের প্রতিবেশী। দাস্যভাবেই সুবল দামিনীর পায়ে সবকিছু সমর্পণ করে সুখী হত। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে এ হেন মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে চায়নি দামিনী। নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে সুবলের কাছ থেকে। কিন্তু সুবলের সেই মানসিকতা রয়েই গেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দামিনীর দাম্পত্যে সুবল যেন মূর্তিমান অশান্তি। অথচ অভাবের দিনে সুবলকেই মনে পড়ে তার। আর মনে না পড়লেও সুবল দামিনীর অজান্তে অযাচিতভাবেও মাঝে মাঝে টাকাটা, সিকিটা লুকিয়ে রেখে আসে। স্ত্রীর বাল্যসাথীর দয়ার দান গোষ্ঠর কাছেও অসহ্য। এই দানের মধ্যে সে অন্য ইঙ্গিত পায়, আবার পৌরুষেও আঘাত লাগে। অথচ প্রয়োজনে দুজনেই সুবলের সাহায্য হাত পেতে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

মনের তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে হয় অভাবী মানুষকে। কাবলীওলার গালিগালাজ, মহাজনের কটুবাক্য, সুবলের অযাচিত দান-সবকিছুই গোষ্ঠকে মাথা পেতে নিতে হয়, কখনও বা এই কঠিন সত্যর হাত থেকে বাঁচতে সে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে সবুজ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে, যেখানে আশায় বাঁচে চাষা। কষ্ট করে ফলানো সবুজ ফসল তাকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। মাঠের পথ ধরে এগিয়ে যেতেই আশার আলো চোখে পড়ে। আষাড়ের সবুজ মাঠ, কচি কচি ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে যেন বলে, -

“ধান, ধান, ধান-ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান।
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম!”[২]

গোষ্ঠ এক দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছে করে সেখানেই দিনরাত্রি ধান কেটে ফেলবে। কিন্তু তা আর হয়না। সমাজে যারা অভাব সৃষ্টি করে, সুকৌশলে চাষার সম্পদ জমি ক্রমশ তাদেরই হস্তগত হয়। সেইভাবেই গোষ্ঠর জমি দখল করে চলেছে দত্ত। কিন্তু দেশে আইন শৃঙ্খলা আছে। সেই আইনের নাম করে আর এক ধরনের শোষণ চলে মামলার নামে। মামলাবাজ সরকার গোষ্ঠকে সেই পরামর্শই দেয়। জেলার সদরে থাকে সতীশ সরকার। পাঁচজনের মামলার তদ্বির করে দু-চার পয়সা টেকস্থ করে। সে গোষ্ঠকে বোঝায় মামলা করতে নয়তো তার জোতজমি নিলেম হবে, আর নেবে ওই দত্ত। গোষ্ঠ কিন্তু সচেতন, সে জানে মামলার থেকে আমলারা ভয়ঙ্কর। তাই সে বলে –

“মামলাকে কি আর ডরাই সরকার মশায়, ডরাই যত আমলাকে, খাঁই আর মেটে না।”[৩]

সরকারের গায়ে লাগে গোষ্ঠর এই কথাটা। ছোটলোকের মুখে এই ধরনের কথা শুনতে এরা অভ্যস্থ নয়। এরা সেই চিরদিনের পীড়নের ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সরকার বোঝাতে চায়, আমলারা পয়সা খেয়ে নেমখহারামি করে না। গোষ্ঠও তার অদৃষ্টের কথা ভেবে কপালে করাঘাত করে। আজই সে সুদের দুটো টাকা কিভাবে দিয়েছে, সে ই জানে। সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়। তার জমি, তার অন্নদাত্রী মা ভূমিলক্ষ্মী। চাষার এই সরল বিশ্বাসে অবিশ্বাস করে, সচেতন চাষাকে ভুল বোঝাতে চায়, -

> “চাষা কি সাধে বলে রে, বুদ্ধিগুণেই চাষা বলে; হুঁ, তোমার দোষ কি, বল? ন চাষা সজ্জনায়তে-এ যে শাস্ত্রবাণী।”[৪]

চাষার গায়ে লাগে কথাটা।

একদিকে দত্ত, অন্যদিকে সরকার। গোষ্ঠ মানুষকে আর বিশ্বাস করতে চায় না। বরং সরকারের মতলব তার কাছে স্পষ্ট। তাই বলে, “মামলার খরচ কে দেবে সরকার, বুদ্ধি তো তোমার কায়েতের বটে, কিন্তু যাতে রস, ওই জমি আমার লক্ষ্মী মা, ও গেলে খরচ যোগাবে কে? তুমি দেবে?” কায়েতের গায়েও কথাটা লাগে, সে বোঝায় তখন অন্য কথা। জমিতে দখল নিতে এসে, বাঁশগাড়ি করতে এলে তুলে ফেলার পরামর্শ দেয়। গোষ্ঠও বলে সে দখল ছাড়বে না, মামলা যা করার ও করুক। সরকার তখন প্রমাদ গোণে। এমন চাষাকে বোকা বানানো এত সহজে হওয়ার নয়। কিন্তু গোষ্ঠরও মনের জিজ্ঞাসা, অর্থ যার নেই, সামর্থ্য ছাড়া উপায় কি। সরকার তখন জমিদারের চাপরাসীর পেতল বাঁধা লাঠির ভয় দেখায়। গোষ্ঠ জানে এসবকিছুর মূলে ক্ষুধার জ্বালা, -

> "মানুষ জন্মায় ক্ষুধা লইয়া, সে ক্ষুধা তাহার মরণ অবধি মেটে না; মরণেও তাহার লয় নাই; মানুষ মরে, অতৃপ্ত ক্ষুধা তাহার ধরণীর বুকে হা-হা করিয়া বেড়ায়, তাহার পর পুরুষের বুকে আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া মানুষের ক্ষুধার আজ অন্ত নাই। দিনে দিনে সে অসহ লোলুপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।
> আদি যুগে উদরের ক্ষুধায় মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে, আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি জাতি অপর জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে, আজ একটা মানুষেরই ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না। ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবার অবকাশ নাই, মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুসে নিস্পন্দ, ব্যর্থ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় যুক।"[৫]

স্বাভাবিক, যুগ-যুগান্তের, পিতৃ-পিতামহের পুষে রাখা জমিদার ভীতির সংস্কার বুকের মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। বুকের ঘূর্ণিটার বল, বেগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সরকার সেই ক্ষীণতার সুযোগে খরচের হিসাবটা বুঝিয়ে দেয়। বিনা চিকিৎসায় মারা যায় গোষ্ঠর রুগ্ন ছেলেটা। দুঃসময়ে সুবলই এসে পাশে দাঁড়ায়। পুত্রশোকের ঘোর কাটতে না কাটতেই দত্ত তার জমির দখল নিতে চায়।

> "বঞ্চনার, প্রতারণার ক্ষোভে সেথা জাগিয়া উঠে বিপুল ক্রোধ, সে যেন একটা ঘূর্ণি। আগুনের শিখা যেন পাক খাইয়া মাথার দিকে ছুটে, জ্ঞান বিবেচনার অবসর থাকে না।"[৬]

গোষ্ঠ যায় পাশের গাঁয়ের রামভল্লার কাছে। রসিক দত্ত, জমিদারের নগদী, আদালতের পেয়াদা, নিজের রাখাল আর ঢুলি নিয়ে বাঁশগাড়ি করতে থাকে; রামভল্লাকে দেখে পালিয়ে গেলেও ফল হয় মারাত্মক। জমিদারের চাপরাসির হাতে নির্যাতিত হতে হবে ভেবে সে পালিয়ে যায়; অপমানের হাত থেকে সুবল বাঁচায় দামিনীকে। শুধু তাই নয়, নিজের অবরুদ্ধ কামনাকে চরিতার্থ করতে সে দ্বিধা করে না। দামিনীও অসহায়। সুতরাং গোষ্ঠর এই জীবনে আছে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, জমিদার, মহাজন, মামলাবাজ প্রভৃতির অত্যাচার। একে একে সে সব হারিয়েছে; ছেলেকেও হারাতে হয়েছে। তবু এইভাবেই হয়তো সে মরত গ্রামে থেকেই। কিন্তু বন্যার জলোচ্ছ্বাস তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেলে শহরে। সঙ্গে আসে সুবল; তার ভালবাসার মানুষের দুর্দিনে।

এখানে বাইরের কোন শক্তি গোষ্ঠকে শহরে টানেনি। গোষ্ঠ বাধ্য হয়েছে। শরৎচন্দ্রের গফুর বর্ণগত জাতিগত নানা ভাবে অত্যাচারিত। সে আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ফুলবেড়ের চটকলের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছিল। গোষ্ঠ গ্রামেই মরত হয়তো কিন্তু প্রকৃতির অসীম কৃপা তাকে গ্রামে মরতে দেয়নি। শহরে এসেছে সে, কারণ সেখানেই তার অকাল মৃত্যু লেখা ছিল। শুরু হয় গোষ্ঠর শহরের জীবন।

> "আধা শহর। কালো কালো পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুই পাশে দোকান-পান-বিড়ি, মিষ্টি, মনিহারী, চকচকে ঠুনকো জিনিসে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহিঃসৌন্দর্যের আস্ফালন।
> ওপাশে রেলস্টেশনের ধারে স্তূপ বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তাঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা। আশপাশ পর্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত। লোহার দোকান, শুধু ঝনঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র-টামনা, গাঁইতি, শাবল, সব যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র, রৌদ্রের আলোয় চকচক করে। ধারে ধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা ঘিরিয়া ধানের কল, বয়লারের আঁচে গরম জলের ভাপে সব যেন আগুন।"[৭]

কাজের কোনও বিরাম নেই। আট আনা, দশ আনা মজুরীতে তারা সাত-আট ঘণ্টার আয়ু বিকায়, এই সাত-আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচবার প্রয়াসে নিঃশ্বাস নেয়ার অধিকার নেই। এই জীবন্ত প্রেতেদের শহরে এসে পড়ল গোষ্ঠ।

এই জীবনের পীড়নটা স্বাভাবিকই অন্য ধরনের। সর্বস্বান্ত হয়ে আসা চাষা এই পরিস্থিতিতে মনে করে, এই খেটে-খাওয়ার জীবনে, গতরে খেটে, সে তার দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু কারখানার শ্রমিকের যান্ত্রিক জীবন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। স্ত্রীর আব্রু রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। সারাদিনের অমানুষিক ক্লান্তি কাটাতে নেশা করতে হয়। এই মানুষগুলি শ্রমিকসঙ্ঘের সভায় শুনতে পেল অন্য কথা, বাবুরা সেকথাই বলে। বাবুদের সম্বোধনে 'তোমরা' লক্ষ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করার বিষয়। এরা একাধারে - "...মাটির বুক চিরে ফসল ফলায়... আগুনের সঙ্গে লড়াই করে কল চালায়... মাটির ভেতর খনির অন্ধকূপে সোনা রূপো হীরে জহরৎ খুঁড়ে বের করে।" অর্থাৎ "... তোমরা হচ্ছ দুনিয়ার হাত, তোমরা দুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে দুনিয়া খায়"। এসবই তাদের পক্ষে অহঙ্কার জাগানো কথা। আত্মবিস্মৃতি, নাইটস্কুল-সবকিছুর আলোচনার পর, বাউরীর দল দলছুট হতে চাইল। বুড়ী সাবি বাউরিনী আত্মবিস্মৃত হতে পারল না। গরীব মানুষ, গরীব মানুষের মতোই থাকতে চায়, নয়তো ভয় লাগে। তারা মালিককে মানবে। তাদের মহোৎসবে মালিকপক্ষ দশটাকা বকশিশ দিয়েছে, মদের জন্য।

এদিকে মালিকপক্ষে কাজের চাপের জন্য শ্রমিকদের কাজের সময় একঘণ্টা বাড়িয়েছে, সাময়িকভাবে। মজুরিও বাড়িয়েছে, তবে সামান্য। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি, অবসাদ দূর করতে, 'আয়ুক্ষয়-করা বিষ'। ঠিক হল কেউ ওভারটাইম খাটবে না। বাউরীরাও রাজি হল। সকলকে নিয়ে জমাটবস্তি হয় বটতলায়। এবার শুধু ওভারটাইম নয়, মাইনে বাড়াবার আলোচনা না মানলে ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে সামিল হয় গোষ্ঠ। সে জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এখানে কোনও ফাঁকি নেই। শহুরে রাজনীতির শিকার হয় গোষ্ঠ। ধর্মঘট ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু এই চৈতালী ঘূর্ণি যেন কালবৈশাখীর আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। সেই চূড়ান্ত পরিবর্তনের আশাই শিবকালীর মুখে শোনা গেল - 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর'। চৈতালীঘূর্ণির শেষাংশে লেখকের আশাবাদ যে ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশিত, তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।

শ্রমিক হয়ে ওঠা শহরের মানুষ যন্ত্রের পেষনে জমাট বেঁধে অন্যায়ের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। গোষ্ঠও সামিল হয় এই ধর্মঘটে। তবে ধর্মঘট করেও এই মানুষগুলি সমস্যা থেকে মুক্তি পায় না। ধনীশ্রেণির সঙ্গে মজুর দলের সংঘাত হয় এবং গোষ্ঠ এই তাণ্ডবে প্রাণ হারায়, -

> "হাসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়, পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া। গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু মাঝে মাঝে পেটের জ্বালার আক্রোশে চীৎকার করে, জান দেগা, লেকেন নেহি যায়গা। বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে গিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।
> ডাক্তার ও-ঘরে চলিয়া যায়।
> কম্পাউণ্ডার হাতে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, করুণায় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, কহে, যে ফল হ'ল, মরতে গরিবই ম'ল।"[৮]

সরল গোষ্ঠর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের দীর্ঘ অত্যাচারের ফলে নিম্নবর্গ শ্রেণির যে চিরকালীন সংকট তার থেকে মুক্তির উপায় তার উপায় তো নেই, বরং বিদ্রোহ করলে প্রাণ হারাতে হয় এই অন্ত্যজ শ্রেণিকেই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে যুগ পরিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। সামন্ততন্ত্র শেষ হয়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব-এই সময়টা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন গভীরভাবে। নিজে জমিদার বংশের সন্তান। জমিদারদের শেষ অবস্থার করুণ পরিণতি 'জলসাঘর' গল্পে লক্ষ্য করা গেছে। ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামজীবনের সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গজিয়ে ওঠা কলকারখানা, কৃষক, ক্ষেত মজুরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শহরে, নয়তো শহর চলে আসছে গ্রামে। গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটছে। পুরোনো মূল্যবোধগুলো ভেঙে যাচ্ছে এমনি এক টালমাটাল অবস্থাকে উপলব্ধি করেছেন লেখক। দুই যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাকে সমর্থন করবেন, সেই জায়গাটা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। 'কালিন্দী' উপন্যাসের এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমস্যার অন্য এক রূপ ধরা পড়েছে। পুরো ব্যাপারটা জমিদার বনাম শিল্পপতির হলেও নিম্নবর্গের মানুষের সমস্যা বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে।

যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে 'কালিন্দী' উপন্যাসখানি রচিত। যুগপরিবর্তনের সেই ইতিহাস, যে ইতিহাসে কৃষির জায়গা দখল করেছে শিল্প। নদীর বুকে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে বিবাদ; বিবাদ জমিদারের সঙ্গে কৃষকের; কৃষকের সঙ্গে সাঁওতালদের। পরিশেষে এই চর জমিকে ব্যবসায়ের মূলধন বানাতে এসে পৌঁছে গেছে বড় বড় ব্যবসায়ী। গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার স্থান দখল করতে বাইরে থেকে এসেছে শিল্পপতির দল। তারই মাঝে উলুখাগড়ার মতো অবস্থা হয়েছে গ্রামের

কৃষক-প্রজা ও সাঁওতালদের। সাঁওতালরাই এই চরজমিতে আগে ফসল ফলিয়েছে আর সকলের নজরে এসেছে সেই চরজমি। আর তারপরেই বিবাদ। সর্ব বিবাদের সমাপ্তি ঘটেছে ব্যবসায়ীদের আগমনে। নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর থেকে প্রভুশক্তির রূপ বদলেছে, বদলেছে তাদের ব্যবহার, শোষণের পদ্ধতি। জমিদারও রেহাই পায়নি এই লড়াইয়ে। তাই জমিদার-প্রজার সম্পর্ক গেছে, তার বদলে এসেছে শিল্পপতিদের সঙ্গে যান্ত্রিক সম্পর্ক।

উপন্যাসটির ঘটনাধারা জমিদারবাড়ির শরিকদের বিবাদ-বিসংবাদ ঘিরে আবর্তিত। এই জমিদারী জগতেই আছে রংলাল, নবীন, ননী পাল সব চাষীরা। 'ব্রিটিশ রাষ্ট্রের আইন যে চাষীর পক্ষে নয়, একথা এ চাষীরা জানে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে একাধিকবার এটাই দেখানো হয়েছে মামলায় জিৎ বা বিচারে শাস্তি দানের সঙ্গে 'ধর্মের'', মানবিকতার যোগ নেই। রায়হাট গ্রামের প্রান্তে, ব্রাহ্মণী নদী, স্থায়ীয় নাম কালিন্দী। সেই কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরজমির দখল নিয়ে এখানে কাহিনি দানা বেঁধে উঠেছে। এই উপন্যাসের মূল প্রতিপক্ষ ইন্দ্ররায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তী। এই বিবাদে অবশ্য রামেশ্বরের ভূমিকা নেই। রামেশ্বরের দিন গেছে, প্রতিপত্তিও প্রায় নিঃশেষ, চোখেও আলো সয় না, অন্ধকার ঘরে –

> 'ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মতো পড়ে থাকেন। সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব নায়েব যোগেশ মজুমদারের, যা সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে পরিবারকে। আড়ালে থেকে দেখাশুনা করেন রামেশ্বরের দ্বিতীয় পত্নী সুনীতি এবং দুই পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র।'[৯]

বর্তমানে প্রতিপত্তি ইন্দ্র রায়ের। রায়েদের শাখা-প্রশাখা অনেক। কালিন্দীর বুকে গজিয়ে ওঠা চর নিয়ে যে বিসংবাদ, সেখানে রামেশ্বর চক্রবর্তী ছাড়া অনেকেই দাবিদার। রায়েদের শরিকরা তো আছেই। স্বয়ং ইন্দ্ররায় আছেন, আছে মহাজন। মহাজনের যুক্তি, তাদের কাছে আবন্ধীয় জমির সংলগ্ন এই চর। কিছু প্রজাও আছে দাবি নিয়ে। কালিন্দীর গ্রাসে তাদের এপারের জমি গেছে তাই এই চরই তাদের ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তাদের যুক্তি অকাট্য, এ পারে তাদের জমি খেয়ে তবে নদী ওপারে উগ্রেছে; ইন্দ্র রার বলেছিল, -

> "চরটা কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপে পরিপূর্ণ। গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলি-মাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে-অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।"[১০]

যে চরের দখল নিয়ে এতো আয়োজন সেই চরের ইতিহাস অন্য কথা বলে। আর এই ইতিহাস টেনে বের করে আনে, রামেশ্বরের ছোট ছেলে অহীন্দ্র। অহীন্দ্রর সঙ্গে গ্রামের প্রজাদের সম্পর্ক আছে। সে প্রজাদের মোড়ল বৃদ্ধ রংলালের কাছে শুনেছে এর ইতিবৃত্ত। কালিনীর তটে কচি নধর ঘাস, গ্রামের গরু খেয়ে শেষ করতে পারত না। তার পরে তরির জমিতে হতো তুঁত চাষ, চাষীরা গুটিপোকা পালন করত। গ্রামের শোভা তখন অনুপম। তারপর কালিনীর কূল ভাঙল, 'কালী যাকে নিলে, কার সাধ্যি তাঁকে বাঁচায়' সেই বছর শীতকালে কালিন্দীর স্রোত ও পরের দিকে বালি ঠেলে রায়হাটের কোল ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর বছরের পর বছর ও পাশের জমিতে পলি জমতে জমতে, ছয়মাস জল, ছয়মাস বালির স্তূপ। এপারের গোচারণের জমি গ্রাস করল কালিন্দী আর বর্ষার শেষে বালির ওপর পলির স্তর। রংলাল বলে, -

> "এই, ওপারে যা খেতেন কালী, এসে উগরে দিতেন এই চরের ওপর। আর তার ওপর দিতেন মাটি আর বালি চাপা।"[১১]

এইভাবেই কালিন্দীতে চর জেগেছে।

এই চর নিয়ে কারও মাথা ব্যথা ছিল না। শুধু খাল, চোরাবালি, বালির স্তূপ আর পোকা, বিষধর সাপ। সাঁওতালরা এসে এখানে চাষবাস, বসতি করায় নজরে পড়েছে সবার। কারণ সাঁওতালরাই এখানে সোনা ফলিয়েছে। এই সাঁওতালদের সঙ্গে চক্রবর্তী বাড়ির সম্পর্ক প্রাচীন। রামেশ্বরের পিতা সোমেশ্বর সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন এবং এই বিদ্রোহেই তিনি প্রাণ সমর্পণ করেন। তিনি ছিলেন এদের রাঙাঠাকুর। রাঙাঠাকুর চলে গেছেন কিন্তু নাতি অহীন্দ্রকে এরা আবার নতুন করে পেয়েছে। অহীন্দ্র এদের কাছে রাঙাবাবু বলে পরিচিত। যে রাঙাবাবু প্রজাদের কথা শোনে, সাঁওতালদের কথা শোনে এবং তাদের প্রাপ্যটুকু পাইয়ে দিতে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

রংলাল অভিজ্ঞ চাষি, পুরোনো দিনের লোক, জমিদারের বিশ্বস্ত প্রজা। সে জমিদারবাড়িতে গিয়ে সুনীতির কাছে আর্জি নিয়ে আসে। আইনের কথা বলে। তার বিবেচনায় রামেশ্বর চক্রবর্তী তিন আনা চারগণ্ডার মালিক, ওই চর জমির। জমিদার ইন্দ্ররায় সাঁওতাল মাঝিকে চরে বসবাসের জন্য জমির খাজনা বাবদ টিপ সই দিতে বাধ্য করে। মাঝিকে উদ্দেশ্য করে রায় হেসে বলে, -

> "এ চর আমার। মাঝি বলিল, সি আমরা জানি না। আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হ'লে কবুলতি লিখে দিতে হবে। মাঝি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সিটো আবার কি বেটে গো? কাগজে লিখে দিতে হবে যে, আপনি আমাদের জমিদার, আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি-কিস্তি মিটিয়ে দেব। তার পর সেই কাগজে তোরা আঙ্গুলের টিপছাপ দিবি। মাঝি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছে। রায় বলিলেন, কথাটা বুঝলি তো? কবুলতি লিখে দিতে হবে।"[১২]

মালিকপক্ষকে সে সচেতন করতে চায়। সে এসেছিল গরীব প্রজাদের হয়ে ধর্মের কথা বলতে, কিন্তু আইন তো ধর্মের ধার ধারে না। তবু সে আইনের কথা বলে, তার গরীব প্রজাদের জন্য ধর্মের দিকটা দেখতে অনুরোধ জানিয়ে যায়। কিন্তু ইন্দ্ররায়কে না জানিয়ে উপায় নেই। ইন্দ্ররায় রামেশ্বরের প্রথম পত্নী রাধারানীর সহোদর। ইন্দ্ররায় এই ব্যাপারে দমবার পাত্র নন। এদিকে সাঁওতালদের স্বভাব হল জমি জঙ্গল পড়ে থাকতে দেখলে, বসে যায় সেখানে। এইভাবেই তারা চরজমিতে ফসল ফলিয়ে বসবাস করছে। এরা জমিদারের কবুলতি বোঝে না। টিপছাপকেও এরা বেশ ভয় পায়। কমল মাঝির নাতনি বেশ সাহসের সঙ্গে বলে,

> "তুরা যদি খত লিখে দিস লিস একশ, দুশ টাকা পাবি লিখিস?"[১৩]

তবে ইন্দ্ররায় সে ধরনের জমিদার নয়। তবুও সেকথা এরা বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। কমলমাঝির একটাই কথা, রাঙাবাবু বললে তারা টিপছাপ দেবে; কবুলতি লিখে দেবে জমিদার ইন্দ্ররায়কে। কারণ ইন্দ্ররায়ের দাবি, এ চর তাঁর। আর এই চর কে কেন্দ্র করে জমিদারের অত্যাচারের পাশাপাশি মামলা মোকদ্দমা, সেই সঙ্গে হাজত, জমিদারের লাঠিয়ালদের ফসল কেড়ে নেওয়া, চর জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া চলতে থাকে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলির উপকর এই শোষণ ও অত্যাচার চলতে থাকে।

কিন্তু সবকিছুর পর একসময় চরজমির দখল নেয় কলের মালিকরা। জমিদার সেখানে অসহায়। অসহায় অন্ত্যজ শ্রেণির প্রজা এবং সাঁওতালরাও। টাকার লোভে এদের চরিত্র নষ্ট। যারা মেনে নিতে পারে না, তাদের কথা আলাদা কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পেটের দায়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই অন্ত্যজ শ্রেণির মাথার ওপর যে শাসক শক্তি চিরকাল ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে, এই শাসক শক্তির বদল হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'শক্তির ধারাটা ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে'। সেই বৈশ্যদের আছে টাকার জোর। সাধারণ মানুষের 'পেটের জ্বালা'কে মূলধন করে এরা এদের যন্ত্রের মধ্যে পেষণ করছে, মনুষত্বের সবটুকু 'গুঁড়া' করে এদের 'মজুর' সত্তাটিকে শুধু এরা জাগিয়ে রেখেছে। ওদের 'পেটের জ্বালাই' এদের 'কলের স্টীম উৎপন্ন করে' তখন সেই জ্বালাতেই মানুষ বৈশ্যশক্তির বশীভূত হয়েছে। এই চরম সত্যটা রবীন্দ্রনাথ তার সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছিলেন। সেই সত্য এখানেও প্রমাণিত। কারণ এই ব্যবস্থা চিরকালের। অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্গত মানুষ সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী ইতিহাসের পট পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, তার উপরিবর্তীর শাসন ও শোষণ মেনে নিতে বাধ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য উপন্যাসের মতোই কালিন্দী উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায় কৃষি জমির জায়গা ক্রমশই দখল করেছে শিল্প। নদীর বুকে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে ব্যবসার মূলধন করতে চাই বড় ব্যবসায়ীরা। এক্ষেত্রে সমস্যা অন্ত্যজ শ্রেণির কৃষকদের পাশাপাশি রয়েছে সাঁওতালদেরও। কালিন্দীর চর ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে গেল। এই ভাবেই হার মানতে বাধ্য হয় নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণিকে। দৈনিক মজুরির স্বাদ পেয়ে সাঁওতালরা চাষ ছেড়েছে। সাঁওতালদের বড় একটা দল নতুন চরের উদ্দেশ্যে চলে গেছে। কলের মালিক সমস্ত চর দখল করে নিলে রংলাল চাষীদের জমি যায়। "ওই দূরে-নতুন ওঠা সর্বনাশা চরটার কোল ঘেঁষিয়া শীর্ণ। কালিন্দীর বারোমেসে অগভীর অপরিসর জলধারা

বহিয়া চলিয়াছে। মন্থর তাহার গতি এখন। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালিন্দীর জল-স্রোতের মধ্যে নূতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। গাছ-গাছালির মধ্যে চিনির কলের চিমনীটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমনীটার গায়ে প্রভাতসূর্যের রৌদ্র পড়িয়াছে তাহাও ফুটিয়াছে প্রতিবিম্বের মধ্যে।"[১৪] কালিন্দির চরে আজ উদ্যত চিমনি কারখানার অট্টালিকা, লোকজন ভর্তি চর। কালিন্দী উপন্যাসে পরিবর্তনের হাওয়া গ্রাম্য মানুষগুলিকে কারখানায় প্রবেশ করিয়েছে। এখানে জমিদারের অসহায়তার পাশাপাশি আমরা কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ইতিহাস জানতে পারি। নিম্ন সাঁওতাল শ্রেণির কথা যেন কারোর কাছে খাটেই না, তারা যেমনভাবে চিরজীবন সংকটের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে অতিবাহিত করেছে এখনো সেই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করছে কোন পরিবর্তন ছাড়াই। কারণ সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলি বরাবরই উপেক্ষা ও দয়া ভিক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবন জীবিকা পরিচালিত করে। উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী-র রেট-রিকেই বোঝা যায় তারাশঙ্করের ঐতিহাসিক বীক্ষাকে। অথচ ইন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি –

> "চাষীরা সব আমাদের বিপক্ষ হয়ে কলের মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অথচ এতদিন খুন করলেও তারা আমাদের বিপক্ষে কথা বলেনি, বিচার বলে মেনে নিয়েছে।"[১৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, ডোম, বাউরি, বোষ্টম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাহিনি নিয়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাড়াজাগানো উপন্যাস 'কবি' (১৯৪৩)। এই উপন্যাসে তিনি অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চারিত্র্যের রূপকার হিসেবে নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'কবি' উপন্যাসেও তিনি অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনের ভাঙাগড়া, প্রেম-বিচ্ছেদকে তুলে ধরেছেন। 'কবি' উপন্যাসে লেখক ডোম সম্প্রদায়ের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সেখানে তুলে ধরেছেন ঝুমুর দলের জীবনচিত্র।

অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের জীবনকে উপজীব্য করে 'কবি' উপন্যাসটি রচিত। কবিয়ালের নাম নেতাইচরণ। সংক্ষেপে নেতাই। নেতাইয়ের জন্ম হিন্দুসমাজের পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশে। তবে শহরের ডোমের সঙ্গে তাদের কিছু পার্থক্য আছে। এরা লাঠিয়াল। এদের উপাধি বীরবংশী। নেতাইয়ের মামা গৌর অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। ডাকাতি বংশীয় একজন মানুষের কবি হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর চিত্তাকর্শক বিশিষ্ট কাহিনি উপন্যাস এ বর্নিত হয়েছে।

ডাকাত বংশে জন্ম নেওয়া নিতাইয়ের কবিতা গানের প্রচার নেশা। বিভিন্ন আসরে গান উপস্থাপনা তার ইচ্ছা। গুরুত্বপূর্ণ 'গোবরেফুল'র মতো পদ নিতাইয়ের। কবি প্রতিভাকে নিতাই স্রষ্টাপ্রদত্ত অলৌকিক এক জ্ঞান মনে করে। তাই সৎভাবে সেই প্রতিভার বিকাশে পিতৃভিটা ছেড়ে দেওয়া যায়। ওখানে তার বন্ধু রাজা (স্টেশনের পয়েন্টসম্যান) নিতাইকে 'উস্তাদ' সম্বোধন করে তার থাকার বন্দোবস্ত করে। বিভিন্ন আসরে আসরে নিতাই কবিতাগান করে। ফলে 'কবি' হিসাবে তার নাম ঈষৎভাবে ছড়াতে থাকে। আর নেতাইয়ের বাপ সিঁদেল চোর। পিতামহ ঠ্যাঙাড়ে। সবমিলিয়ে নেতাই যে বংশে জন্মেছে, সেখান থেকে কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বা কবিয়ালরূপে আত্মপ্রকাশ করা সহজ নয়। কিন্তু নেতাইচরণ কবিয়ালদের দোহার হিসেবে কাজ করত। চিরকালের জমজমাট কবিগানের পালায় যারা এই সম্প্রদায়কে মাতিয়ে রাখে তাদের মধ্যে রয়েছে নোটনদাস ও মহাদেব পাল। এই সমারোহে প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। কবিগানের আসরে অনুপস্থিত নোটনদাস। ফলে মেলা কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। লোকেরাও হইহই করে গোলমাল করতে শুরু করে। এই সুযোগে নেতাই তার জীবনে কবিয়াল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অভিজ্ঞ মহাদেবের কাছে হেরে গেলেও তার উদ্দেশ্য সফল হয়। আসরে উপস্থিত হয়ে নিতাই গ্রাম্য কবিয়ালের ছড়ার জবাব দিয়ে সবার মন জয় করে, -

"শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন।
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন॥
রব উঠিল-ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল-ডুডুম।
নিতাই বলিল -

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই।
তেঁই গোলোকপতি-বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী।"[১৬]

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হয়ে যায়। ছন্দে বাঁধা এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক হয়। রাজার বউয়ের হাসি থেমে গিয়েছে। ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসে পড়ে দেহের বেশবাসও অসংযত।

বাবা-মামার পথে না গিয়ে নিজেকে কবিয়াল হিসেবে গড়ার মনোবাসনা ছিল নিতাইয়ের। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যের বাইরে গিয়ে সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণিকে জায়গা দেওয়া হয় না। অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন সর্বদাই হুমকির সম্মুখীন। ডোম জীবন ছেড়ে নেতাইও কবিয়াল হওয়ার পথে বাধা পায়। নেতাই বাপ-দাদা-মামার পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত না করে যখন কবিয়াল হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তত করে তখন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হতে হয়। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে জমিদার একখানা কাপড় দেওয়ার ঘোষণা করলে নিতাইও স্কুলে যেতে শুরু করে। কিন্তু একে একে ডোমবংশীয় সব ছেলে স্কুল ত্যাগ করলেও নেতাই পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়। ডোমের ছেলে ডোম হবে এমনটাই তো সমাজের আবহমান চিত্র। সেখানে নেতাই কেন এত বিদ্যাবুদ্ধি গ্রহণ করতে হবে। মামাতো-মাসতুতো ভাইয়েরা তাকে পণ্ডিত মশায় বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে। মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বছরের জেল খেটে ঘরে ফিরেছে। সেও নেতাইকে তাদের স্বাভাবিক ধারায় আসতে বলে।

শোষণ বঞ্চনার মধ্যেও নেতাই নিজের লক্ষ অবিচল রেখেছে। নেতাইচরণের ভাগ্যই তাকে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের পালাগানের আসরে এক প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগই নেতাইয়ের ভাগ্যরেখা বদলে দেয়। অট্টহাস গ্রাম একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘীপূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা একটি বিশিষ্ট পর্ব। এই পূজাকে কেন্দ্র করে অট্টহাসে মেলাও বসে। সেখানে প্রত্যেকবার কবিগানের আসরে মেতে ওঠে স্থানীয়রা।

নেতাইয়ের জীবনযাত্রার নবযাত্রাকে কেন্দ্র করে মামা গৌরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। নেতাইয়ের জীবনে আসে একের পর এক পরীক্ষা। নিজের প্রতিভাকে টিকিয়ে রাখতে শুরু করে নানারকম কাজ। বাড়ি থেকে বের হয়ে স্টেশনে থাকার সুবাদে পরিচয় ঘটে স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজলালের সঙ্গে। নেতাইয়ের কবিগানে মাতে রাজলালের ষোলো-সতেরো বছরের শ্যালিকা। বিবাহিত। যাকে রাজলাল ঠাকুরঝি বলে সম্বোধন করত। নেতাইও এই কালো, নির্বোধ বালিকাটিকে ঠাকুরঝি রূপেই সম্বোধন করত। নেতাইকে প্রতিদিন দুধ দিতে আসত ঠাকুরঝি। একসময় নেতাই অনুভব করে ঠাকুরঝির প্রতি ভালোবাসা। তেমনি ঠাকুরঝিও নেতাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

"সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল, ঠাকুরঝিকে সে ভালোবাসে। ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালোবাসে।"[১৭]

কিন্তু মিলন সম্ভব হয় না। কারণ ঠাকুরঝি বিবাহিত। মিলন সম্ভব নয় জেনেই নেতাই ঠাকুরঝির থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। এরমধ্যে গ্রামে আসে ঝুমুর দল। পূর্বে ঝুমুর গান অন্য রকম ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী নিয়ে ঝুমুরের দল গান বাজনা করে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। কেউ বায়না করলে সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পেড়ে গান-বাজনা আরম্ভ করে দেয়। মেয়েরা নাচে, গায় অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা এসে জমে যায়। মেয়েদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, সেই দলের কর্ত্রী। আর দলটি যার ওপর নির্ভর করে নিজেদের কর্তৃত্ব জানান দেয়, তার নাম বসন্ত। বসন। নেতাইও একদিন ঝুমুর দলে যোগ দেয়। স্থানে স্থানে গান-বাজনায় আসর জমিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। তবে ঝুমুর দলের এরা গান-বাজনা করলেও মূলত দেহোপজীবিনী। প্রতি আসরের পূর্বেই পরিপূর্ণ গ্লাস মদ খেয়ে তবেই খেউড়ে অশ্লীলতায় মেতে ওঠে ঝুমুরদল। ভাষায়-ভাবে-ভঙ্গিতে অশ্লীল কোনোকিছুই তাদের মুখে বাধে না। বসন তাদের নেতৃত্বস্থানীয়া। প্রৌঢ় মাসি তাকে দিয়েই শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল, উলঙ্গবাহার শাড়ি। এই কাপড় আজ পরব। কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় অর্ধ নগ্নরূপে নৃত্য করিবে।"[১৮]

বসন্তদের বিভীষিকাময় জীবনের নানা দিক তারাশঙ্করের উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিহরে উঠতে হয় বসনদের পরিণতি দেখে। সমাজের নানা অজনা-অদ্ভুত জীবনে আজও সমাজে বাস করে চলেছে অসংখ্য বসন, নেতাই। এমনি বসন্তের প্রেমে নেতাই নিজেকে রাঙাতে চায় কিন্তু যাদের জীবিকাই ঝুমুর দলে নেচে-গেয়ে, তাদের স্বাভাবিক জীবন থাকতে নেই। বসন্তকে সঙ্গ দিতে হয় ঝুমুর দলের শ্রোতাদের। খেউড় অর্থাৎ নগ্ন-অশ্লীলতার গান গেয়ে শ্রোতাদের দাবি পূরণ করতে হয়। নিত্যনতুন সমাগমে দেহে রোগ বাসা বাঁধে বসন্তের। বসন্ত বিছানায় পড়ে ছটফট করতে থাকে। সেবা-যত্নে সঙ্গ দেয় নেতাই। তবু বসনকে বাঁচানো যায় না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তার সমগ্র দেহবর্ণের লাবণ্য, উজ্জ্বলতা নিঃশেষ করে দিয়েছে।

> "বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝকঝকে ক্ষুরের মতো মুখের হাসি, আগুনের শিখার মতো তাপ, তেমনি রঙ তেমনই রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাড়ের মতোই বসন্তের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেলো। গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিলো, বসন একটা প্রতিবাদও করিলো না।মরণ সত্য সত্যই তো। গহনার উপর বসন্তের কত মমতা! সেই গহনা প্রৌঢ়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য তাহার কত যত্ন, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হত না-সেই দেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু খতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ সব এক মুহূর্তে মরণ ঘুচাইয়া দিল!"[১৯]

অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনের গতিবিধিই এমন। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্গত। নেতাই, গৌর, রাজলাল, ঠাকুরঝি, বসন, বিপ্রপ্রদ, তারণ মণ্ডল, মাসি, নোটনদাস, মহাদেব পাল, নির্মলা প্রভৃতি। প্রত্যেকেই জীবন পরিচালনার জন্য একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছে। কিন্তু জীবনের কোথাও এদের শান্তি মেলেনি। নোটনদাস তার চেয়ে খানিক উচ্চবর্গের দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত। বসনও ঝুমুর দলে খেউড় নাচ-গানে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু দিনশেষে নিজেই কঠিন অসুখে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছে। যেই দলের হয়ে প্রাণপাত করেছে সেই দলের কর্ত্রী কোনো রকম মায়ার ছলে কাছে টেনে নেয়নি তাকে। আবার নেতাই প্রেমে মজলেও নিজের অবস্থানগত কারণে প্রেমিকাকে রক্ষা করতে পারেনি। জীবনচক্রে না পাওয়ার বেদনা তাকে পুড়িয়েছে প্রতিনিয়ত। ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ে ঘরছাড়া হলেও বসনকেও জীবনে পায়নি। ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের সবই তার চেনা কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার দুদণ্ড সুখ যা পেয়েছিল, বসনের মৃত্যুর কোলে সব হারিয়ে আবার ফিরে গেছে চিরচেনা গ্রামে। কিন্তু সেখানে এসেও শুনতে পায় ঠাকুরঝির মৃত্যুর খবর। হাহাকারের জীবনী শক্তি পেয়েছে তার রচিত গানে —

> "এই খেদ আমার মনে
> ভালোবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে!
> হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
> এ ভুবনে?"[২০]

কবি উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চরিত্রের রূপায়ণ তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। খুব কাছ থেকেই যে জীবনকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিরহমিলনের অন্তর্লীন ভালোবাসায় যেন প্রতিফলিত হয়েছে এ উপন্যাসে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চারিত্র্য। সমাজ ও মানুষ ছবি। রাঢ় বাংলার এত নিপুণ সমাজ চিত্রায়ণ খুব কম ঔপন্যাসিকের হাতে ভাষা পেয়েছে। যে ভাষা আজ অবধি পাঠককে অবিরত মুগ্ধ করে। সৃষ্টিসম্ভারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কালজয়ী।

'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকলেন পুরোপুরি এক ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই জীবনের অনেকটাই সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। সমাজের একেবারে নিচুস্তরের ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত এক মানুষের কবিয়াল হয়ে ওঠা এবং

এই হয়ে ওঠার পিছনে দুই নারীর অবদান আর এই দুই নারীর প্রেমস্পর্শে নিতাইচরণের আত্মোপলব্ধি ও হৃদয় দ্বন্দ্ব নিয়ে জীবন সংগ্রামের কাহিনি 'কবি'। তাই 'কবি' উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের যে জীবন ধরা পড়েছে, তা মানুষের অন্তর্জীবন। নানা বর্ণে রঞ্জিত সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাদের এই সমাজ বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছে। কিন্তু সেই আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা এবং এই পরিবেশে নিম্নবর্গের মানুষের টিকে থাকার ইতিবৃত্ত এখানের মূল প্রসঙ্গ হয়ে ওঠেনি। এখানের মূল বিষয় হল, মানুষে মানুষে সম্পর্ক। নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে রেলওয়ে পয়েন্টস্ম্যান রাজার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরঝি আর বসন্তকে ঘিরে গভীর সম্পর্ক, ঝুমুর দলের প্রতিটি মানুষের সম্পর্ক-এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা, জীবনের কথা, সমাজের চোখে তুচ্ছ, নগণ্য, অচ্ছুৎ মানুষগুলির মূল্যবান জীবনের কথা এখানে গান হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির এক কবিয়ালের কণ্ঠে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'গণদেবতা' (১৯৪২)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' এবং 'পঞ্চগ্রাম' দুটি ভিন্ন উপন্যাস হিসেবে আমরা পড়ি। আসলে কিন্তু দুটো দুই খণ্ডে লেখা একই উপন্যাস। এক অংশের নাম 'চণ্ডীমণ্ডপ', অপর অংশের নাম 'পঞ্চগ্রাম'। এই দুই অংশের একসঙ্গে সাধারণ নাম 'গণদেবতা'। কিন্তু 'চণ্ডীমণ্ডপ' অংশের নামকরণ হয় 'গণদেবতা' আর সে নামেই উপন্যাসটি বিখ্যাত। উপন্যাসটির পটভূমি ময়ূরাক্ষী নদীর ও তার তীরবর্তী পাঁচটি গ্রামের জনজীবন নিয়ে। যেহেতু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ের মানুষ ছিলেন। তাই রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির সাথে তার গভীর যোগ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার বই বলুন আর যাই বলুন সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ"। এই অঞ্চলের ডোম, বাউরী, বাগদী, হাড়ি, মুচি প্রভৃতি জাতি যেমন আছে তেমনি গ্রামের অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণির কথা আছে এই উপন্যাসে। জমিদারি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কিভাবে দিনের পর দিন অন্ত্যজ মানুষগুলিকে দমিয়ে রেখেছে, দীর্ঘদিন ধরে মুখ বুজে সহ্য করেছে। তারা খুবই অল্প মজুরি অথবা কখনো কখনো কোনো মজুরি ছাড়াই তারা তাদের পরিশ্রম দিয়ে এসেছে উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণির কাছে। তবে এই উপন্যাসে বারবার শ্রীহরীর কাছে তারা বিপর্যস্ত হলেও থেমে থাকেনি।

গণদেবতা উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে পাশাপাশি দুইটি গ্রাম শিবপুর এবং কালিপুর নিয়ে, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে। শিবকালিপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিচুবংশ যেমন কামার, সূত্রধর, বায়েন, নাপিত এবং ধোপাদের বসবাস বেশি। পৈতৃক সূত্রে তারা গ্রামে তাদের বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ গুলো করে। উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে এই নিচু জাতের মানুষকে কেন্দ্র করে। পাশবর্তী মহাগ্রাম, পঞ্চগ্রাম এবং কঙ্কনায় জমিদার শ্রেণির মানুষের বসবাস। শিবকালীপুর গ্রামের নিচু বংশের মানুষগুলো অবস্থাপন্ন কৃষক এবং জমিদারদের হাতের পুতুল। তাদের নিজস্বতা বলে কিছু নাই। কামার লোহার জিনিস তৈরি করে দেয় ধানের বিনিময়ে, ছুতার, বায়েন, নাপিত, ধোপা, দাই প্রত্যেকেই এরকম ধানের বিনিময়ে কাজ করে দেয়। কখনো ধান পায়, আর না পেলে বাকি পড়ে থাকে। ধান আদায়ের নির্দিষ্ট কোন পথ নাই। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারনে দূর্ভিক্ষ লেগে আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। বিদেশী দ্রব্যের কদর বেড়ে গিয়েছে যার ফলে কামার, ছুতারদের ব্যবসার ধ্বস নেমেছে। কামারের গড়া পেরেক, গজাল, হাতা,খুন্তির বদলে তারা সস্তায় বিদেশ থেকে আসা সামগ্রী বাজার থেকে কিনে নিচ্ছে। একারণে কামার অনিরুদ্ধ এবং ছুতার গিরশ তাদের গ্রামের ব্যবসা উঠিয়ে জংসন শহরে গিয়ে দোকান তৈরি করেছে। তাতে গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণির মানুষেরও বেশ কাজের কষ্ট হয়েছে জমিতে ফসল রোপনের সময়। গ্রামের মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মজলিশ বসায়।

> "গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরে ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদী। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চন্ডীমণ্ডপটি বহুকালেয় এবং এক কোণ ভাঙা হইয়া আছে; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতীশূড়ে-বড়দল-তীরসাপ্তা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষর অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়া-ছিল। নীচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চন্ডীমণ্ডপের এই নাট-মন্দিরে বা আটচালায় শতরঞ্চি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।"[২১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মজলিশে কারণ দর্শিয়ে অনিরুদ্ধ বলে দেয় তারা গ্রামে আর কাজ করতে পারবে না। গ্রামের নতুন ধনী শ্রীহরি পালের সাথে তার বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় পুরানো পাওনার হিসাব নিয়ে। অনিরুদ্ধ মিটমাট করে নিলেও রাতের আধারে শ্রীহরি অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির ধান কেটে নেয়।

শিবকালীপুর গ্রামে প্রথমে উচুবংশের বিরুদ্ধে নিচুবংশের বিরুদ্ধতা, প্রতিবাদ দেখা দেয়। অনিরুদ্ধের দেখাদেখি গ্রামের পাতু বায়েন, তারা নাপিত, লুটনি দাই এবং ধোপা প্রভৃতি মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা নগদ ছাড়া কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। গ্রামের উচ্চবংশীয় মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। চিন্তিত মানুষদের মধ্যে দেবু ঘোষ অন্যতম। গণদেবতা উপন্যাসের নায়ক দেবনাথ ঘোষ। দেবু ঘোষ স্বতন্ত্র মানুষ। অসচ্ছল পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে ভালো ছাত্র হয়েও লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়। গ্রামের স্কুলে পড়ায়। স্কুলের লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও সে যখন যেখানে যে বই পায় তাই পড়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে। দেবু ঘোষ বুঝতে পারে কামার,ছুতার, বায়েন, ধোপা এবং দাই শ্রেনির মানুষের গ্রামের উচু শ্রেনির মানুষের প্রতি বিরুদ্ধতা কেনো। শ্রীহরি পালের মতো মানুষ যেখানে প্রধান ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কেউ শাসন করতে পারে না সেই গ্রামে বিরুদ্ধ প্রতিবাদ আসবেই। শ্রীহরি পাল ওরফে ছিরু পাল নতুন গড়ে ওঠা ধনী ব্যক্তি। জমিদারদের সমকক্ষ একজন। দূর্ধর্ষ আর গোঁয়ার, প্রকৃতির একজন মানুষ। প্রকাশ্যে লোকে তাকে সম্মান দিলেও মনে মনে ঘৃণা করে। শ্রীহরি তা জানে। জানে বলেই সে গ্রামের মানুষের প্রতি নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে বেশি। জমির আল বাড়িয়ে নেয়। মানুষের সীমানার কিনারায় রাতারাতি দেয়াল তুলে জমি বাড়িয়ে নেয়। নিজের আধিপত্য স্বীকার করানোর জন্য গ্রামের নিচু শ্রেনির নিরীহ মানুষের ঘরে আগুন লাগায়। নিজে গিয়ে তাদেরই সাহায্য করে। প্রকাশ্যে যৌন জীবন যাপন করে। পরের স্ত্রীকে প্রবল ভাবে কামনা করে। যৌন ব্যধিতে মুখের সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে তার। খ্যাতির আকাঙখায় টাকা যে পথে উপার্জন করে সেই পথেই লুটায়। তবুও মানুষ তাকে ঘৃণাই করে।

রোজগারের আশায় গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ শহরমুখী হয়েছে পূর্ণ সচেতনতায়। অনিরুদ্ধ কামার, গিরিশ ছুতার বাজার শহরে গিয়ে বসছে রোজগারের জন্য। গ্রামে পয়সা নেই। আগের মতো জিনিস তৈরি হচ্ছে না। লোকে সস্তায় বাজার থেকে প্রয়োজনের জিনিস কিনছে। গ্রামীণ বিনিময় প্রথায় জিনিসের বদলে মূল্যও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং তাদের একথার যুক্তি আছে যে, খাটি খুটি খাই-এখানে কারও কিছু বলার নেই। অনিরুদ্ধর মতো মানুষ চেষ্টা করেছে আয় বাড়ানোর জন্য। পিতৃপুরুষের জমিতে চাষ করেও সে নিজের পেশা বজায় রাখবে; আবার শহরের বাজারে বসবে অতিরিক্ত লাভের আশায়। কিন্তু ছিরুপালের গোমস্তাগিরির আওতায় থেকে আগের মতো গ্রামে পড়ে থেকে মার খাওয়ার কোনও যুক্তি নেই তাঁর কাছে। একথা সে সাহসের সঙ্গে বলতে পারে। ছিরুপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে বুক ফুলিয়ে জেল খাটতে যায়। গ্রামে গিরিশের ডাক পড়ে না। সস্তায় মিস্ত্রি এনে কাজ হচ্ছে। গিরিশ অনিরুদ্ধর দোসর। সে না মেটালে গিরিশও মেটাবে না। গিরিশের স্পষ্ট কথা, -

> “...আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কথা ছিল। সস্তাগন্ডার বাজার ছিল-তখন ধান নিয়ে, কাজ করে আমাদের পুষিয়েছে-আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়?”[২২]

না পোষানোর জন্যই গ্রামীণ বিনিময় প্রথায় আর আস্থা থাকছে না। যুগ বদলেছে, সস্তার জিনিস বাজার থেকে গ্রামে ঢুকেছে। সুতরাং এভাবে গ্রামে বসে মার খাওয়ার যুক্তি সেও খুঁজে পায় না।

তারা নাপিতও সেই পথ অবলম্বন করেছে। ধান নিয়ে গোটা বছর সে সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ করতে পারবে না। যাদের জমি নেই, হাল নেই, তারা ধানও দিতে পারে না, আবার যাদের আছে, তারাও ঠিকঠাক দেয় না। সুতরাং সে নগদ কারবার শুরু করেছে। সামাজিক কাজে নাপিতের একটা ভূমিকা আছে। নিত্য নৈমিত্তিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কথা ভেবে তারার সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসা হয়েছে। তবে অর্ধেক রেটে সে নগদে কাজ করে। সেদিক দিয়ে তার জিত। তারাচরণ যথেষ্ট চতুর এবং কৌশলী। সে নিরপেক্ষ হলেও দেবুকে ভালবাসে, অনিরুদ্ধ গিরিশের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখে। সকালে উঠে সে তাদের মতো জংশনে যায়। অনিরুদ্ধর কামারশালার পাশে বটের ছায়ায় ইঁট পেতে বসে। পাঁচখানি গ্রামের মধ্যে তিনখানি গ্রামের ক্রিয়াকর্মে, পূজাপার্বণে সে যায়। নগদ বিদায়ের ফলে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাপিতের প্রাপ্য চাল, কাপড় ইত্যাদি সে ইদানিং পরিত্যাগ করেছে। তারা নিজের মতো করে জীবিকা নির্বাহ করে। অবস্থার পরিবর্তনে লুটনী দাইও নগদ বিদায় চায়।

পাতুবায়েন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশে বলেছিল, সে গোটা গ্রামের 'আঙোটজুতি' যোগাতে পারবে না। কারণ তার বদলে সে কিছুই পায় না। ছিরুপালের মুনিষ 'আঙোটজুতি' চাইতে এলে, পয়সা আনতে বলায় তার ফল তাকে পেতে হয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই ছিরুপাল এসে তাকে বেদম পিটিয়েছে। পাতুর ক্ষোভ, -

> "আমার পেট চলে কি করে- সেটা আপনারা বিচার করবেন না, আর এমনি করে মারবেন?"[২৩]

এর সঙ্গে অবশ্য আর একটা আক্রোশ যুক্ত ছিল। ভদ্রলোকের পাপ ধরতে চিরকালই আছে নিম্নবর্গের দরিদ্র রমণী। তাই ছিরুপালের সম্পর্ক ছিল পাতুর বোন দুর্গার সঙ্গে। পাতু কখনও বুঝি ছিরুকে বলেছিল সেকথা, তাদের জাতের মধ্যে নিন্দার কথাটাও সে বলেছিল। ছিরুপাল নিচুজাতের মানুষের এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারেনি। অন্যদিকে, -

> "চণ্ডীমণ্ডপে তখন জমজমাট মজলিস। ভূপাল বাগদি লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ষষ্ঠীতলার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে-পাতু, রামহরি, পরী, বাঁকা, ছিদাম, ফড়িং আরও জনকয়েক। পাশে পড়িয়া আছে কয়েক আঁটি তালপাতার বোঝা। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের সম্পত্তি; সেখানকার তালগাছও জমিদারের। সেই গাছ হইতে পাতা কাটার অপরাধে ভূপাল সকলকে ধরিয়া আনিয়াছে।"[২৪]

মানুষকে এরা মানুষ বলে মনে করে না। ভাগাড় যাদের তারা নিশ্চয়ই গ্রামের 'আঙোটজুতি' করবে। কিন্তু ভাগাড়ও চলে গেছে লোভী মানুষের কবলে। অন্যদিকে দুর্গার ঘরে শ্রীহরির আসাটা ভাল চোখে দেখেনি পাতু। সেকথা কানে শোনার পর হঠাৎ শ্রীহরির পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। জ্বলন্ত বিড়িটা সে পাতুর ঘরের চালে গুঁজে দিয়ে আসে। সমস্ত হরিজন পল্লীটাই পুড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে মনিবেরাই সাহায্য করে। কিন্তু পাতুর সে উপায় নেই। সে জাতিতে বায়েন, মানে মুচি। তার কিছু চাকরান জমি আছে। গ্রামের সরকারি শিবতলা, কালীতলা, পার্শ্ববর্তী চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজানোর কারণে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পেয়ে আসছে। দুটি হেলে বলদ নিয়ে, নিজের জমির সঙ্গে কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমি সে ভাগে চাষ করে। কিন্তু সেটেলমেন্টের পর পাতুর চাকরান জমি গেছে। সে নিজেই দেবোত্তর জমি ছেড়েছে। তার ধারণা তিন বিঘা জমি নিয়ে বারোমাস পালে-পার্বণে ঢাক বাজিয়ে কি হবে? যেদিন বাজাতে হবে সেই দিনটাই মাটি তার চেয়ে বরং নগদ মজুরিতে এখানে ওখানে বাজনা বাজিয়ে আসে। দুই-একটি টাকার সঙ্গে পুরোনো জামা কাপড় তার উপরি পাওনা। বারোমাস সে বেকার। কারণ বাদ্যকর বায়েন বলে সেই সম্ভ্রমে সে জনমজুর খাটতে নারাজ। ভাগাড়ের মরা গরুমহিষের চামড়া ছাড়িয়ে সে চামড়া ব্যবসায়ী শেখদের বিক্রি করত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করাতে তার ঐদিকের আয় কমেছে। কঙ্কণার ভদ্রলোকেরা খত ছাড়া কিছু দেবে না। এই খত লেখানোতে তার ভয়। শেষ পর্যন্ত নালিশ করে তার আশ্রয় ওই বাড়িটুকু নিয়ে বসলে সে যায় কোথায়। এদিকে বোনের কেলেঙ্কারির কথা বলে ফেলে সে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। এখন পতিত হওয়ার ভয় তার আছে। তাই সে দুর্গাকে পৃথকান্ন করেছে।

পাতু কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবে। সে ভাগাড় বন্দোবস্তের কথা ভাবে। তারই স্বজাতি নীলুবায়েন এখন চামড়ার ব্যবসা করে লক্ষপতি। তাহলে সেই বা স্বপ্ন দেখবে না কেন। এখানে অনিরুদ্ধর সঙ্গে তার মিল আছে। সেক্ষেত্রেও সেই আত্মসম্মানবোধ, যে জন্য পাতু অন্যের জমিতে জনমজুর খাটতে নারাজ, সেই একই আত্মসম্মান বোধে অনিরুদ্ধ টাকা ধার করে জোত কেনার কথা ভেবেছে। জগন ডাক্তার এসে হরিজন পল্লীতে নানা পরামর্শ দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদন পত্র পাঠাতে হবে। সতীশ বাউরি এতে ভয় পায়, হাঙ্গামার ভয়। তবুও সতীশদের আসতে হয় আবেদনপত্রের জন্য জগনডাক্তারের কাছে। পাতু কিন্তু এদের থেকে আলাদা। পাতু যাবে ওপারের জংশনে। সেখানে থাকবে। 'যেখেনে খাটবে সেখানেই ভাত'।

সতীশের মধ্যে একটা বিপ্লবী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তার প্রকাশ ঘটে দেবু কারাবরণ শেষে ফিরে এলে। ঘেটুগানের আসরে সে দেবুকে আমন্ত্রণ জানায়। বাস্তব সমস্যায় কথা জানায়। পেটের দায়ে ভিনগাঁয়ে সব চাকরি করতে যেতে হয়। মেয়েরাও রোজ খাটছে। পঞ্চায়েত করে বারণ করলেও তারা শোনে নি। অভাবের জন্যই তাদের এই অবস্থা।

স্থানীয় ঘটনাকে অবলম্বন করে ঘেটুগানের মধ্যে দিয়ে দেবুর অন্যায় কারাবরণকে তুলে ধরেছে তারা। সতীশই সেই গান লিখেছে, -

> "ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে,/ অধম সতীশ লুটায় এসে তাঁরই চরণ-তলে..."[২৫]

সতীশ এইভাবেই তার বিদ্রোহী মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে। উপেন বায়েনের সৎকারের সময় দেখা যায় বায়েন পাড়ায়, সক্ষম পুরুষ মাত্র তিনজন। একজন আবার ভয়ে পালিয়েছে। এদিকে বাউরিরা মুচির শব স্পর্শ করবে না। কিন্তু বাউরিদের মাতব্বর সতীশকে পাওয়া যায় এই সমাজসেবা মূলক কাজে। পাতুও এগিয়ে আসে এই কাজে।

সতীশ পাতুর মতো এতটা ভাবনা-চিন্তা না করলেও যথেষ্ট আত্মসচেতন। বাউরি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ মাতব্বর গোছের লোক সতীশ। তার নিজের হাল গরু আছে, পরের জমি ভাগে চাষ করে। কথায়-বার্তায় সে বেশ বিজ্ঞ ধরনের। দেবুপণ্ডিত তাদের যে সম্মান দিয়ে কথা বলে, এটা সে অনুভব করে। উপন্যাসের শেষে দেবু ও যতীনের করুন ফুটে ওঠে,

> "ময়ূরাক্ষীর গর্ভে' নামিয়া যতীন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সু-উচ্চ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান ঊর্ধ্ব বাহু, দেবুকে দেখিয়া সে আনন্দে তৃপ্তিতে মোহগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।"[২৬]

সময় বদলাচ্ছে। মানুষ তার নিজের নিজের জায়গাটা বুঝতে শিখেছে। বড় মানুষের এই অবজ্ঞা ও অসম্মান এরা ভিতর থেকে সহ্য করতে পারে না। সতীশ সেটেলমেন্টের ব্যাপারে চিন্তিত। পাকাধানের ওপর দিয়ে শেকল টেনে মাপ হবে, তাহলে ধান থাকবে কি করে। দিন-রাত খেটে ধান কেটে ফেলার মতো অসম্ভব ব্যাপার কি করেই বা সম্ভব হবে। জগন ডাক্তারের কথা মতো দরখাস্ত করতে সে মনের সায় পায় না। ঘর পুড়ে যাওয়ার পর দরখাস্ত করে কোনও ফল হয়নি। সে অভিজ্ঞতাও তার আছে।

দুর্গার মত নিম্ন জাতের বেশ্যাকেও আমরা দেখি প্রতিবাদী হয়ে উঠতে। অর্থাৎ এই উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে অন্ত্যজ শ্রেণির সংকট চিরকালীন হয়ে রয়েছে ঠিকই, তবে তারা নিজেদের অধিকার পেতে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে, তারা বিদ্রোহ করছে, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছে না। ফলে অন্ত্যজ শ্রেণির যে বৈষম্য বিভেদ তা সমাজের চোখে ধীরে ধীরে অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কখনো তা সংগ্রামের পথে কখনো বা নিজেদের অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের প্রথম ধারার শেষ পর্বের মহাকাব্যিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর ভূমি নির্ভর আভিজাত্য বোধে জারিত জীবন ব্যবস্থার মাঝে বিত্ত-মর্যাদা-সচেতন অর্থদৃপ্ত অহমিকার অনুষঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-এর একটা অনুষঙ্গ তাঁর নিজের জীবন কাহিনি যেন প্রতিচ্ছবি। উচ্চকোটির জীবন আর নিম্নকোটির জীবনযাত্রার সংঘাত এই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর কৌম সমাজের গোষ্ঠী জীবনকে বিষয়ভুক্ত করেছেন। উপন্যাসটিতে রয়েছে সমান্তরাল দুটি কাহিনি। বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁক এর কাহার সম্প্রদায়ের সুসংহত জীবনের পতন, কৃষি নির্ভর জীবনের পরিসমাপ্তি ও কাঁশ বন ঘেরা উপকথার হাঁসুলী বাঁক বিরানভূমি পরিণত হওয়ার কাহিনী 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। কাহার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ও বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের যন্ত্রকলে তাদের দাসে পরিণত হবার কাহিনী 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।

বাঁশবাদি ও জাঙুল নিয়ে বিস্তৃত কাহারপাড়া। প্রায় খান তিরিশ অন্ত্যজ কাহারের বাস এই বাঁশবাদি গ্রাম। কাহারেরা আজ অবলুপ্তির পথে। বাঁশবাদি জাঙুলে শুধু যে কাহারেরা আছে তা নয় তন্তুবায়, স্দগোপ, নাপিত এসবেরাও আছে। কাহারেরাও দু-ভাগে বিভক্ত- বেহারা কাহার, আটপৌরে কাহার। দু-পাড়াতেই রেষারেষি আছে। বেহারা কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী, আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরম। বনওয়ারীর খুব নামডাক। কথিত আছে তার বাবা-ঠাকুর্দারা এক কাঁধে পাল্কি নিয়ে এককোশ পথ চলে যেতে পারত। বাঁশবাদি এলাকায় আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে বেহারা কাহাররা বাস করে, -

> "বাশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম-গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে-ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে-কাহার। বেহারা-কাহারপাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ

> ঘর বসতি। পূর্ব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। কোশকেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারা-পাড়ার মুরুব্বি। বেহারা-কাহারেরা পাখী বয়। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাকি নিয়ে এক ক্রোশ পথ চ'লে যেত, কাঁধ পর্যন্ত বদল করত না-তাই ওদের বাড়ির নামই 'কোশকেঁধেদের' বাড়ি।"[২৭]

কোপাই নদী ঘিরে রয়েছে বাঁশবাদী জাঙুল গ্রামটিকে। তারাশঙ্কর সঠিক উপমাটিই ব্যবহার করেছেন হাঁসুলী। হাঁসুলী অর্থাৎ হার এর্থাৎ বিশেষ ধরনের ভূষণ। সেটি যেমন নারীর গলাকে বেষ্টন করে শোভাবর্ধন করে ঠিক তেমনি কোপাই বাঁশবাদি ও জাঙুলকে ঘিরে শোভাবর্ধন করছে। হঠাৎ একদিন প্রবল বর্ষায় জমিতে জল দাঁড়িয়ে যায়। ফসলের ক্ষতি হয়। কাহারদের ঘর-বাড়ি ভেঙে যায়। কোপাই তখন ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে এসে দেখা দেয়। বর্ষা কেটে গেলে পলি পড়ে। সেই পলিই উপহার দেয় নানাধরনের ধানের। ধানের ঘ্রাণে কাহারপাড়ার বাতাস ম ম করতে থাকে। কোপাই তখন শান্ত, স্থির। তির তির করে বইতে থাকে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল।

কিন্তু হঠাৎ করেই কাহারপাড়া অশান্ত হয়ে উঠেছে। কাহারেরা বলছে 'বাবু মশায়েরা তরাস পেয়েছেন। কেউ বুঝতে পারছে না প্রতিদিন রাতে বাঁশবাদিতে কে শিস্ দিচ্ছে? প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিল ব্যাপারটা বৃন্দাবনী ধরনের কিছু। দেবতা-যক্ষ না রক্ষ কিছুই বোঝা যচ্ছে না। সবাই সন্ত্রস্ত। কাহার পাড়ার উপকথার বুড়ি সুচাঁদ সকলকে সতর্ক করে বলে চলে 'এ ভাল লয়, এ ভাল লয়'। কাহারদের মনে হয় সুচাঁদের মুখ দিয়ে দেবতাই হয়তো বলে চলেন এই কথাগুলি। করালীর কুকুর কালোয়ার হঠাৎ মৃত্যু হয়। করালী দেখতে চায় কিসের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত। হঠাৎ দেখা যায় বাঁশবাদির জঙ্গলের শীর্ষে আগুনে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে কর্তাবাবার বাহন। কর্তাবাবা কাহার পাড়াকে শিস দিয়ে জানান দিচ্ছেন তিনি সতর্ক করছেন। সুচাঁদ বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে ফেঁদে বসে উপকথার গল্প। কর্তাবাবা ও তার বাহনের প্রভাবের কথা। কিভাবে তৈরি হল কাহার পাড়া। করালীর কর্মের জন্য বাবাঠাকুর রুষ্ট হবেন ও তারজন্য চাই প্রায়শ্চিত্তের পুজো - সুচাঁদ এ বিধান দেয়। সারা কাহারপাড়া করালীর কৃতকর্মের জন্য পুজো দিতে প্রতিশ্রুত হয়। করালীর স্পর্ধায় বনওয়ারী বিস্মিত। করালি কর্তা আবার বাহনকে পুড়িয়ে মারে। যা দেখে বন ওরি অবাক হয়, -

> "যেখানে শব্দটি উঠছে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে করালী। বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে একদৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুছছে আর উপরের দিকে চেয়ে দেখছে। নীচে আগুন নাচছে শুকনো পাতার স্তূপে। উত্তাপে বাঁশবেড় যেন অগ্নিগড় হয়ে উঠেছে, আঁচ লাগছে গায়ে, করালীর সেও গ্রাহ নাই।"[২৮]

বাহনকে মারার স্পর্ধা কাহারপল্লীর কারও যে হতে পারে এ সত্যই অবিশ্বাস্য। করালী সে স্পর্ধা দেখিয়েছে। সাপটি মারার কৃতিত্ব সে দেখিয়েছে। মোটা বকশিস লাভের আশায় চন্দনপুরের রেল কারখানার ম্যানদের দেখাতে চেয়েছে। করালীর সাহসে বনওয়ারী মুগ্ধ। বকশিস পেয়ে সাহস বেড়ে গেল। চন্দনপুর যাওয়ার পথে বাধা দিল বনওয়ারী। সুচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল বাবার বাহনকে দাহ করা হবে। কাহারপাড়ার সকলকে চান করতে হবে। করালী ও তার সঙ্গী সাথীদের ফিরতে হল। বনওয়ারীর কথা অমান্য করে এক পা বাড়াতেও সাহস হল না। কিন্তু করালী অভিমানে গেল চন্দনপুর। পাখি বিবাহিতা। তার স্বামী নয়ান সে নয়নকে ছেড়ে এক বছর হল মায়ের কাছে এসে সে রয়েছে। করালীও বিবাহিত, বউ তার ভালো লাগেনি বলেই বউকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে। পাখিকে সে বিয়ে করে। যুদ্ধ লেগেছে খবর পাওয়া যাচ্ছে, করালী গাঁয়ে এসে বলে যায় ইংরাজ, জাপানিতে যুদ্ধ লেগেছে। চাল ডাল, কাপড়ের অগ্নিমূল্য। চন্দনপুরের ডাকে খবর আসছে অহরহ। কালোশশীর প্রতি বনওয়ারীর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। কালোশশী বারবার বনওয়ারীকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকেছে। সে ডাককে ফেরাতে পারেনি কোশকেঁধেদের বনওয়ারী, -

> "কালোশশীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তাকে। কিন্তু ভয় হয়। কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে ফিরে আসা যায় না। এ মদ তার খাওয়ার উপায় নাই। তার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সে দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। কাহার-পাড়ার সে মাতব্বর। মাতব্বরের নিন্দে হ'লে মাতব্বরী থাকে না, লোকে মুখ টিপে হাসে-শাসন মানে না।"[২৯]

কিন্তু সেই আকর্ষণের টানেই মৃত্যু হয়েছে কালোশশীর।

জমি নিয়ে কিছুদিন মেতে থাকার সময় গোপালপুর থেকে মিত্রদের খবর এসেছে বনওয়ারীদের পাল্কি বইবার। বিবাহ ও জ্ঞানগঙ্গা এ দুটিতে এখনও কাহারেরা নিয়ম করে পাল্কি বয়। এখন পায়ে চলার পথ হয়ে গেছে। চন্দনপুরে হয়েছে পুলবন্ধন, রেল যায়। পাল্কির প্রয়োজন আর নেই। কুলকর্মকে ছাড়তেও পারছে না, অন্যদিকে খাওয়ার কষ্ট চরমে। করালীকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। যুদ্ধের সাজ কোট পেন্টুলন পরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাহারপাড়া। বুড়ো, ছোকরা করালীর এ বেশ দেখে বিস্মিত হয়েছে। করালী যুদ্ধের কাজ নিয়েছে। ম্যানদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নতুন কথা শিখেছে। বুঝতে পারছে ঘোষেরা, বড়বাবুরা কি ভাবে দিনের পর দিন তাদের শোষণ করত। করালি ও বনোওয়ারীর দ্বন্দ্ব থানা পর্যন্ত গড়ায়। ষাট দিন প্রবল জ্বরে বনওয়ারী পড়ে থাকে অচৈতন্য। কাহারেরা পড়ে ঘোর সংকটে। যুদ্ধের বাজারে বনওয়ারীর এ হেন অবস্থায় কাহারেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অন্যদিকে বাঁশবাদির জঙ্গলে যুদ্ধের তাঁবু পড়েছে উড়ো জাহাজের আড্ডা বসেছে। বাতাসে গোঁ গোঁ আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধে বাঁশ আর কাঠ চাই। করালী ম্যানদের জানিয়েছে বাঁশবাদি থেকে মিলতে পারে বাঁশ তার কাঠ। সমস্ত বাঁশঝাড় কেটে সাফ করে দিয়েছে সাহেবরা। জান ফিরে বনওয়ারী ক্রমান্বয়ে শুনতে পাচ্ছে বাঁশকাটার শব্দ। সকল কাহার বনওয়ারীকে ছেড়ে গেলেও ছেড়ে যায় নি পাগল আর নসুবালা। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তামাম সাহেবডাঙ্গায় যুদ্ধের তাঁবু পড়েছে, বাঁশ কেটে বাঁশবাদির জঙ্গল শূন্য। রমণ বনওয়ারীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার দুধেল গাই বিক্রি করে পালিয়ে গেছে চন্দনপুর। করালীও সম্পর্ক মানে নি। সুবাসী বনওয়ারীর চিকিৎসা করানোর জন্য সব হাঁস-মুরগী বিক্রি করে পয়সা নিয়ে করালীর ঘরে গিয়ে উঠেছে। পাখি অত্যন্ত কান্নাকাটি করেছে। দা দিয়ে করালীর মাথায় কোপ মেরে কোঠাবাড়িতে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। মেয়ের দুঃখে বসন্তও চৌধুরীবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। উপকথার কথক সুচাঁদ সাইক্লোনের দাপটে আছাড় খেয়ে পড়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত। অসুস্থ বনওয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে তার চেনা হাঁসুলীবাঁকের সঙ্গে মেলাতে পারে না। পাগলকে জানায় এবার তাকে দেহ রাখতে হবে। কোপাইয়ের পাড়ে চিতা সাজানো হল। সমস্ত কাহারপাড়া দেখতে এল তাদের মাতব্বরকে। করালী চিতায় দিল শালকাঠ আর ঘি।

তারাশঙ্কর জানালেন এরপরেই এল ১৯৪৩-এর প্রলয় বান। কাহারপাড়া ভেসে তলিয়ে গেল। উপকথার ছোটনদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল। বনওয়ারী সেই উপকথার ছোট নদীটি। সে আর ব্রাত্য রইল না ১৯৪৩ সালে বন্যার সঙ্গে মিশে সেও ইতিহাস হয়ে গেল। পাগল আজও গান গায়। নসুবালা যায় বাঁশবাদিতে গোবর কুড়াতে। আর কাঁদে। সুচাঁদ স্টেশনের পাশে বসে বলে যায় উপকথার গল্প। কেউ শোনে অর্ধেক, কেউ শোনে প্রথমটা। সুচাঁদ পরিতাপ করে বলে, এ হল হিয়ের জিনিস মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিপড়ে খায়, হাতে রাখলে নখ লাগে, ঘাম লাগে। তাই হিয়ের জিনিস হিয়েতে রাখতে হয়। এরই মাঝে উল্লসিত নসুবালা খবর দেয় সে দেখে এসেছে সেই ডাকাবুকো আবার ফিরে এসেছে। বালি কাটছে গাঁইতি দিয়ে, কি যেন খুঁজছে। সচেতন লেখক তারাশঙ্কর মন্তব্য করেন, উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। করালী গড়বে নতুন হাঁসুলীবাঁক। বনওয়ারীর স্বপ্ন কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে পারে না। এভাবেই করালী হয়ে ওঠে নতুন কালের মাতব্বর।

কাহারেরা তাদের জাত ব্যবসা ছেড়ে, কৃষিকাজ ছেড়ে অন্নবস্ত্রের তাগিদে দলে দলে চন্দনপুরে রেল কারখানায় নাম লেখাল। তবে এই পরিবর্তন বনোয়ারী কখনোই মেনে নেয়নি, কাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, অজ্ঞতার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজের কাছে দিনের পর দিন ঠকা, নিজেদের সুযোগ-সুবিধা না বোঝা, এইসব নিয়েই গোটা উপন্যাসটিতে চলেছে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব। তবে যুগের পরিবর্তন সকলকেই মানতে হয়। যন্ত্রযুগের পরিবর্তন এই অন্ত্যজ শ্রেণীর আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, সংস্কার, বিশ্বাস বদলেছে ঠিকই তবে তাদের নিত্যদিনের দুঃখ ও দুর্দশার অবসান ঘটেনি। অভাব, রোগ, অত্যাচার, শোষণ সেই একই পুরনো জীবন সংকট যেন রয়েই গেছে চিরতরে। তবে এই নিম্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে নবনায়ক করালী তাদের পথ দেখায়। সে গাঁইতি নিয়ে বালি খুড়ছে। অবশেষে আবার সে পুরাতনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরছে।

> "হাঁসুলি বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলি বাঁক।"[৩০]

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ ও আদিবাসীকেন্দ্রিক উপন্যাস গুলি বিশ্লেষণে বহু বৈচিত্র্য মন্ডিত সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে তার সামাজিক আচার- সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথা সর্বোপরি তাদের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় লোক সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত। ভারতীয় মানব সমাজের আদি স্তর যারা তারাই উচ্চবর্গীয় সমাজ বন্ধনের কাছে অবহেলিত, অবজ্ঞাত; সমাজের একপ্রান্তে আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। উপন্যাস গুলিতে বহুমাত্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় এই অন্ত্যজ আদিবাসী যারা - বাগদী, ডোম, সাঁওতাল, বেদিয়া, চন্ডাল, বাজিকর, তাদের বাসস্থান গ্রামের প্রান্তে ঝুপড়ির মতো, খাদ্য অত্যন্ত নিম্নমানের, অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। পরিধান নোংরা শতচ্ছিন্ন। দারিদ্রতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম। বহু শতাব্দী প্রাচীন হাজারো আচার সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসে বাঁধা তাদের লাঞ্ছিত জীবন। শিক্ষার আলোকহীন যুক্তি বুদ্ধির তোয়াক্কা না করা আধা ভৌতিক, অলৌকিক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারে মগ্ন এই অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষগুলোর জীবন। গল্প পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে গ্রামের অন্ত্যজ, আদিবাসী জীবনের ধর্মীয় সংস্কার, বাক্ কেন্দ্রিক বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং এর পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, 'আমার সাহিত্য-জীবন' (১ম খন্ড), 'স্মৃতিকথা' (বৈশাখ, ১৩১৪), বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, পৃ. ৩১৫

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'চৈতালী-ঘূর্ণী', শ্রী তারাশঙ্কর, প্রকাশক-এম, সি; সরকার এন্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ৮

৩. তদেব, পৃ. ১৯

৪. তদেব, পৃ. ১৯

৫. তদেব, পৃ. ২৯

৬. তদেব, পৃ. ৩০

৭. তদেব, পৃ. ৪২

৮. তদেব, পৃ. ৮০

৯. বঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর তারাশঙ্কর-রচনাবলী, 'কালিন্দী', দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, পৃ. ৭

১০. তদেব, পৃ. ১২

১১. তদেব, পৃ. ২১

১২. তদেব, পৃ. ৩৯

১৩. তদেব, পৃ. ৪৫

১৪. তদেব, পৃ. ২৫৯

১৫. তদেব, পৃ. ২৫৬

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি', মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ৯

১৭. তদেব, পৃ. ৫১

১৮. তদেব, পৃ. ৬৫

১৯. তদেব, পৃ. ১৪৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 209 - 227
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০. তদেব, পৃ. ১৫৪
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'গণদেবতা', মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৩
২২. তদেব, পৃ. ৬৫
২৩. তদেব, পৃ. ৯২
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৬
২৫. তদেব, পৃ. ১৭৬
২৬. তদেব, পৃ. ২২৯
২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিখাতা-১২, পৃ. ২২
২৮. তদেব, পৃ. ৪৩
২৯. তদেব, পৃ. ১৪৬
৩০. তদেব, পৃ. ৪৮৫